হাসতে হাসতে হুঁশিয়ার

সম্পাদনা সুদীপ দেব

নি বে দ ন

এক কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা। অতিমারী, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ— এই ত্র্যহস্পর্শে চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। মানুষ হাসতে ভুলে যাচ্ছে, হাসাতে ভুলে যাচ্ছে। যে বাংলা সাহিত্যের দরবারে এক সময় শিবরাম, পরশুরামের মতো লেখক দাপিয়ে রাজত্ব করে গেছেন, এখন যেন সাহিত্যের সেই ধারাটিও ক্ষীণতনু হয়ে এসেছে। ব্যবহারিক জীবনের মতোই পাঠক এখন সাহিত্যক্ষেত্রেও ভয়-ভীতি আর উত্তেজনার মধ্যে বিচরণ করতে চাইছে, তাদের আরও থ্রিল চাই, আরও, আরও।

বইবন্ধু পাবলিশার্স জন্মের প্রথম লগ্নেই এই চলতি স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। ঠিক করল, একটি কৌতুক গল্পের সংকলন করা হবে, আর সেই সংকলন সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকেই। গল্পের মাধ্যমে লোক হাসানো— সে বড়ো কঠিন ব্যাপার! স্বয়ং গুরুদেব শিবরাম বলে গেছেন, 'হাসির গল্প-লিখিয়েকেও জীবন থেকেই তার লেখার উপাদান জোগাড় করতে হয়। অবশ্যি, বাছবিচার করেই— কিন্তু তাহলেও তাকে জীবনকে দেখতে হয়, দেখাতে হয় জীবনকেই। তবে তার জীবনদর্শন ঠিক সোজাসুজি নয়, একটু তির্যক। আর, দেখানোর কায়দাটাও ঈষৎ বেঁকানো। হাসির গল্পের লেখককে দেখতে হয় যে, হাসির হলেও লেখাটা যেন হাস্যকর না হয়।' তার ওপর মানুষের রসবোধও ভিন্ন রুচির। একই ঘটনায় কেউ হাসেন গোঁফের ফাঁকে, কেউ হাসেন অট্টহাসি— আবার সেই ঘটনা হাসির পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞানে কেউ তির্যক হাসেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের দিনে একটি সরস গল্প সংকলন নির্মাণ করা যে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই শুরুতেই আত্মরক্ষা করা গেল সেই একমবেদ্বিতিয়ম শিব্রাম চকর্‌বর্‌তিকে খাড়া করিয়ে। তাঁর একটি অগ্রন্থিত দুষ্প্রাপ্য গল্প ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে— এ আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। এই সময়ের প্রথম সারির লেখকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল

তাঁদের সরস কলমের স্পর্শে সংকলনটিকে অলংকৃত করার জন্য। আর নতুন লেখনীর সন্ধানে ফেসবুকে একটি খোলা পোস্টের মাধ্যমে গল্পের আহ্বান জানানো হল। অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সেই আহ্বানের। তিন শতাধিক জমা-পড়া গল্পের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটিকে বেছে নেওয়া হয়ে দাঁড়াল আরও দুরূহ কাজ। তবে সেই কর্মযজ্ঞে বইবন্ধু পাবলিশার্সের সহযোদ্ধা শিবদা (শিবশঙ্কর চক্রবর্তী), অভীক (অভীক পোদ্দার) ও দীপ্তেশ (দীপ্তেশ চক্রবর্তী) প্রাথমিকভাবে সাহায্য করেছেন আমাকে। সংকলনটিতে সিকি শতক গল্প রাখা হয়েছে। প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম, গল্পকে শব্দসংখ্যার সীমারেখায় বেঁধে রাখব না। লেখকদের জানানো হয়েছিল, কোনও নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা স্থির করা হয়নি— গল্পের প্রয়োজনে শব্দরা আসুক নিজের নিয়মে। তাই এই সংকলনে বারোশো শব্দের নাতিদীর্ঘ গল্পের পাশাপাশি রয়েছে সাড়ে ছ-হাজারের অধিক শব্দসংখ্যার বড়োগল্পও। বিষয়-বৈচিত্র্যেও সংকলনের গল্পগুলি কম যায় না। নির্ভেজাল নির্মল হাসির গল্প থেক রাজনৈতিক স্যাটায়ার, ডার্ক কমেডি থেকে সরস প্রেমের আখ্যান, অদ্ভুতরস থেকে সোমরস— হাসির গল্পের প্রায় প্রতিটি ধারাকেই স্পর্শ করে যাওয়া গেছে, এবং প্রতিটি হাস্যধারার প্রতিনিধি হিসেবে এই গ্রন্থের গল্পগুলি একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করেছে বলেই আমাদের স্থির বিশ্বাস। কেবলমাত্র কলমের জোরেই এক মলাটে একদম নবীন কলমচিও স্থান করে নিয়েছেন এই সময়ের অভিজ্ঞ লেখকদের সঙ্গে। সংকলনের নামকরণেও আমোদের অন্তরালে জাগরূক থাকার সতর্কবার্তা।

এইবার আসা যাক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিষয়ে। বিশেষ করে অগ্রজ লেখক রাজা ভট্টাচার্য-র কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। একটি অনভিজ্ঞ, নতুন প্রকাশনা সংস্থাকে তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষ যেভাবে সময় ও পরামর্শ দিয়েছেন, তা দৃষ্টান্তস্বরূপ। আর আছেন ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়— তাঁর সাহায্য ও প্রশ্রয় ছাড়া এই বই সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত না সে কেবল আমরাই জানি। পরিশেষে, যাঁদের জন্য এই আয়োজন, সেই পাঠকের আনুকূল্য লাভ করলেই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

সুদীপ দেব।
এপ্রিল ২০২২

সূ চি প ত্র

শিবরাম চক্রবর্তী	ষোড়শী ভুবনেশ্বরী	১১
বিপুল দাস	শুভ নববর্ষ	২১
চুমকি চট্টোপাধ্যায়	'ম' কাহিনি	২৬
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়	রাঁধুনি	৩৩
বাণীব্রত গোস্বামী	কলতলায় মিসড্-কল	৪৩
পার্থ দে	ইলেকশন ডিউটি	৫৪
উল্লাস মল্লিক	স্যারমেয় কথা	৮৩
রাজা ভট্টাচার্য	শাহিদ শহিদ হয়...	৯১
সৈকত মুখোপাধ্যায়	নেতি ধোপানির সাবান	১০২
সৌরভ মুখোপাধ্যায়	ঘটিবাবুর হরর	১১৭
প্রকল্প ভট্টাচার্য	কবি হাঁ কবি না	১২৯
বিনোদ ঘোষাল	অফিসের নাম বৃন্দাবন	১৩৮
ঐষিক মজুমদার	হরেকৃষ্ণর দেখা	১৪৫
অভীক সরকার	পান খায়ে ভাইয়া হামারোঁ	১৫৪
চন্দ্রানী ভট্টাচার্য	ঘটক বিদায়	১৬৯
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়	নতুন স্বর্গ	১৮০
সঞ্জিত সাহা	সালিশি বিভ্রাট	১৯৯
প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি	ঠাঁই	২১০

সম্পদ বারিক	গাঁজাখুরি গল্প	২২১
পুষ্পার্ঘ্য দাস	পরি-কাহিনি	২৩৪
কেয়া চ্যাটার্জী	বড়োবাবুর চেয়ার	২৪৫
পরাগ ভূঞ্যা	সিরিয়াল কিলার হওয়ার সহজ উপায়	২৫৫
ঈশান মজুমদার	দক্ষিণের জানালা	২৬৬
অভীক পোদ্দার	যমলোক জমজমাট	২৭৩
অর্ণব ভট্টাচার্য্য	ভাড়াবাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি	২৮৬

লেখক পরিচিতি ২৯৫

ষোড়শী ভুবনেশ্বরী

শিবরাম চক্রবর্তী

কী সুখে যে মানুষ নিজের চিলকোঠার আরাম ছেড়ে চিল্কায় মরতে যায়! ভ্রমকে বাড়তে দিলেই তা ভ্রমণ হয়ে ওঠে এ ধারণা আমার চিরকালের। চিরদিনের মতোই বদ্ধমূল। সেই আমারই যে একদা মতিভ্রম হয়ে দেশভ্রমণে মতি হবে, তা আমি কোনওদিন ভাবতে পারিনি।

কীসের জন্য মানুষ দূরদেশে যাবে, যদি তা দ্বারদেশেই মিলে যায়? হাতের কাছেই যে সুধা, যে মাধুরী, তাই ফুরিয়ে শেষ করা যায় না, কীসের মাধুকরী নিয়ে বিদেশ যাওয়া? যদি দেখার চোখ থাকে তো দুয়ার থেকে দু-আড়ার মধ্যেই অফুরন্ত রহস্য; ভূ-ভারত তো সেই রহস্য-কাহিনিরই ধারাবাহিক। দরজার কাছেই যার ছড়াছড়ি, তার জন্যে হরিদ্বারে গিয়ে গড়াগড়ি দেওয়ার দরকার কী? বাড়ির সঙ্গে আড়ি করে বাইরে যাওয়া বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। চোখের সামনেই নিত্যনতুন। চোখ মেললেই যাকে দেখা যায়, তাকে নাসিক ঘুরে দেখার মানে? নাকাল হওয়া বই তো নয়? নতুনের খোঁজে নিরুদ্দেশে না গেলেও হয়। বাড়ির খাঁজেই খাজা আছে, মজা আছে— নিতুই নব-র উদ্দেশ মিলে যায়।

তবে কিনা, এত বুঝেও— ভ্রম হচ্ছে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। আর বলেছি তো, ভ্রম থেকেই ভ্রমণ। এবং মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম— তাও বলে আবার। আর এই মতিভ্রম, মুনি হলেও যেমন হয়, money হলেও তেমনি হয়ে থাকে। আর তাহলে ওই money— এই মনই মানুষের মন বদলে দেয়।

সে-বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা... পুজোর ফাঁকে টাকাটা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে "ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে"। চিল্কার থেকে প্রবাসিনী এক আত্মীয়ার পত্রাঘাত পেলাম, "এবার পুজোয় বেড়াতে এসো-না এখানে? চিল্কা শহরের

থেকে একটু দূরে এ জায়গাটা আমাদের বেশ নিরিবিলি। তাহলেও হ্রদের ধারেই, কিন্তু তেমন ঘিঞ্জি নয়, গোলমাল নেই, শান্তিময়। অনেকগুলি বাঙালি পরিবার এখানে রয়েছেন। এখানকার পরিবেশ ভালো। দার্জিলিঙেরও পরিবেশ ভালো। আমার কয়েকটি আলাপী সেখানেও হানা দিয়েছেন এবার। তাঁদের আমন্ত্রণ এড়িয়েছি। হোক না পরিরা বেশ। প্রতি পদক্ষেপে পরবৎ ঠেলে পরিবৎদের কাছে যেতে হলে মনে হয়, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"! এ-সব পরিত্যাগ করে ভূমিতে গিয়ে স্থিতু হইগে। ভূমৈব সুখম। পরিলোকে যেতে হলে পর্বতে না গেলেও চলে— পরবৎদের এড়িয়েও যাওয়া যায়। কোনও হাড়ভাঙা কি পাহাড়ভাঙা খাটনি আমার পোষায় না। তাই সেই আপশোশে না এগিয়ে অবশেষে... সেও একরকম পরলোকই বলতে পারি। পরলোকই বলা যায়। চিল্কার খপ্পরে এসে পড়লাম শেষটায়। বৃহদাকার এক হ্রদ আকারে এসে পড়লাম। আমার মতো কলকাতাসক্ত লোক, যাকে কলকাতা থেকে নড়ানো খুব শক্ত— কলকাতার বার করা দূরে থাক, এমনকী হাওড়ার পুল পার করানোই দারুণ ব্যাপার, সে যে চিল্কার পাড়ে এসে... যে নাকি স্বপ্নেও কোনওকালে হাওড়ার কাছে দু-ইস্টিশন দূরের বালিবধেই এগোয়নি কখনও তাকেই যে লঙ্কা ডিঙিয়ে চিল্কায় এসে হাবুডুবু খেতে হবে, তা কে ভেবেছিল! কিন্তু অষ্টম আশ্চর্য, খালি ইতিহাস আর ভূগোলেই নয়, মানুষের মধ্যেও দেখা দেয় এক-এক সময়। যেমন কিনা, আমার মনের চিল-টা আমার বাসার চিলকোঠা থেকে ছোঁ মেরে ভ্রমণের পথে এনে ফেলল... চিল্কার পাড়ে টেনে আনল আমায়, তেমনি আরও এক অষ্টম আশ্চর্য দেখা গেল সেখানে।

অষ্টম আশ্চর্যটিকে লেকের স্বচ্ছ জলের আয়নায় দেখছিলাম। দেখতে দেখতে আরও সব আশ্চর্য দেখা দিতে লাগল। নানা রঙের, নানান ঢঙের। একপো, দেড়পো, আধ সের, পাঁচপো, আড়াইসেরি, পাঁচসেরি সাইজের। দশ-বিশ সেরের এক-একটাকেও ঘাই মেরে উঠতে দেখা গেল মাঝে মাঝে।

এমনকী, আড়াইমনি একটাও যেন লাফিয়ে উঠল হঠাৎ— এই চোখের সামনেই! উঠতে হল আমাকেও। একদৌড়ে বাজারে গিয়ে ছিপ, হুইল ইত্যাদি মাছ ধরার সব সরঞ্জাম কিনলাম। আর সেই আত্মীয়টির কাছ থেকে কিছু মাছধরা ময়দার গুলতি নিয়ে ফিরলাম। টোপর ছাড়া যেমন বর— তেমনি টোপ ছাড়া মৎসবররা ধরা দেন না।

আসতে আসতে ঘণ্টাখানেক গিয়েছে। দেখি এর মধ্যেই এক ভদ্রলোক ছিপ ফেলে সেখানে বসেছেন এবং তাকিয়ে দেখবার মতো কয়েকটিকে ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই। একটি কিশোরী, তারিফ করবার মতোই, খুব সম্ভব তাঁর মেয়েই হবে, উদ্ধৃত মাছগুলি সামলাচ্ছিল। আমি তাঁদের কাছাকাছিই ছিপ নিয়ে বসলাম। কিন্তু বসে থাকাই সার। ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল, একটা মাছও ঠোকরাল না আমার বড়শিতে। ওদিকে জল-তোলপাড় করা আর-একটাকে ভদ্রলোক গেঁথে বসেছেন!

পেল্লায় মাছ! লাফ-ঝাঁপ দেখেই বোঝা যায়। আমার ছিপ ফেলে ওঁকে সাহায্য করতে এগোলাম, কিন্তু তার কোনও দরকার ছিল না। আমি পৌঁছোবার আগেই তিনি আধমণের অবতারটিকে ডাঙায় তুলতে পেরেছেন। একক প্রচেষ্টায়।

"কী টোপ ব্যবহার করছেন আপনি?" কথাচ্ছলে আমি শুধোলাম।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বললেন, "শাপলা-পাপলা।" বলেই সিগ্রেট ধরিয়ে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে টানতে লাগলেন আপন মনে।

শাপলা-পাপলা আবার কী রে বাবা? শাকটাক জাতীয় কিছু নাকি? শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় জানি, কিন্তু মাছ ডাকা যায় বলে শুনিনি তো! হতেও পারে বা, নিরামিষ না হলেও নীরের সঙ্গে মিশে থেকে নিরামিষাশী তো হতেও পারে মাছরা! খেলেও খেতে পারে শাকফাক।

খুকির হাতে টোপদানিটার ফাঁকে উঁকি দিলাম। কাঁকড়ার মতো কতকগুলো কী যেন টিনের কৌটো ভরতি। আঙুল দিয়ে টিপে দেখলাম, নরম বেশ! কিন্তু যদ্দূর আমার জানা, কাঁকড়া তো তার খোলনলচে সব নিয়ে বেশ কড়াই হয়ে থাকে। প্রায় কাঁকরের মতোই, কাঁকড়ার তো নরম হবার কথা নয়। না, জানতে হল ব্যাপারটা—

"মশাই, আমি এ ধারে একেবারে নতুন—" নতুন করে কথা পাড়ি, "এই ধরনের কাঁকড়া কিংবা শাপলা যাই বলুন— কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারেন?"

"পাবেন না।" আমার দিকে সন্দিগ্ধ একটি কটাক্ষ ছুড়ে তিনি বললেন, "এ অঞ্চলে তো নয়। পেতে হলে আপনাকে সেই পুরী কিংবা ভুবনেশ্বর যেতে হবে।"

ফের নিজের ছিপের কাছে ফিরে এলাম। এসে বসলাম চুপটি করে। বসে

রাঁধুনি

কৃ ষ্ণে ন্দু মু খো পা ধ্যা য়

"আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা একটা সংস্থা নই, বিশাল একটা পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের শুধু নিজের নিজের কাজে দক্ষ হলে হবে না। ওগুলো হচ্ছে 'পকেট এক্সপার্টাইজ'। আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে দক্ষ হতে হবে। ফুটবল খেলার মতো। দরকার পড়লে আমি যেমন গ্লাভস পরে গোলকি হয়ে বল জালে ঢোকানো আটকাতে পারব তেমনই সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলে বিপক্ষের জালে গোল দিয়ে আসতে পারব।"

তুমুল হাততালি। তার মধ্যে কে যেন বিড়ালের ডাক ডেকে উঠল। আর তাতেই ধড়ফড় করে ঘুমটা ভেঙে গেল জয়ন্তর। চারদিক নিস্তব্ধ। চোখ মেলে দেখল বাইরে রোদ্দুরটা কড়া হচ্ছে। ঘুম ভেঙে ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগে। আজকাল ধাতস্থ হতে আর-একটু বেশি সময় লাগছে। গোটা পৃথিবীটাই এখন বেনিয়মে চলছে। ক্যালেন্ডারের পাতা বলে যেন কোনও জিনিস নেই। কী বার, কত তারিখ কিছুই কারোর খেয়াল থাকছে না। জয়ন্ত বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল পাঁচিলের ওপর দিয়ে একটা মেনি বিড়াল হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছে। বিড়ালটা বহিরাগত। কিছুদিন এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগল জয়ন্তর। এতক্ষণ যে স্বপ্নটা দেখছিল সেটা মাস ছয়েক আগে অফিসের অ্যানুয়াল ডে-র বক্তৃতা। বক্তৃতাটার সবাই খুব প্রশংসা করেছিল। ইন্দ্র মোবাইলে রেকর্ড করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিল। লকডাউন শুরু হওয়ার আগে পর্যন্তও জয়ন্ত মাঝেমাঝেই তারিয়ে উপভোগ করতে করতে দেখত বক্তৃতাটা। ইদানীং দেখা বন্ধ করেছে। তাই বোধহয় বক্তৃতাটা অভিমান করে স্বপ্নে এসেছিল। পাঁচিলের ওপর থেকে বিড়ালটা আলতো করে ঘাড় ঘুরিয়ে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে ডেকে

উঠল, "ম্যাও!"

বিড়ালটা আর গাছের পাখিগুলোকে দেখে এখন ভয়ানক রাগ হয় জয়ন্তর। এরা কেমন মুক্ত স্বাধীন। গৃহবন্দি হয়ে থাকার কড়াকড়ি মানতে হচ্ছে না। বাইরে ঘোরাঘুরির সময় মাস্কও পরতে হচ্ছে না। আর নিজের বাড়িটা— সেটা আর বাড়ি নয়। আস্ত একটা লেবার ক্যাম্প। একটার পর একটা কাজ। একখণ্ড অবসর নেই। কখনও সেন্টার ফরওয়ার্ডের মতো ন্যাতা সামলাতে হচ্ছে তো কখনও গোলকির মতো প্রেশার কুকারের সিটির অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সপ্তাহে একদিনও ছুটি নেই। বাড়িতে একচিলতে সুখী গৃহকোণ নেই।

আশ্চর্য এই লেবার ক্যাম্প। বাড়িতে চারজন মানুষ। লকডাউন যখন শুরু হল তখন বউ, ছেলে, মেয়ে সবাইকে নিয়ে একটা টিম মিটিং হয়েছিল। কাজের ভাগ। রীতিমতো কাগজ কলম নিয়ে রুটিন তৈরি হয়েছিল। দিব্যি চলেছিল প্রথম কয়েকটা দিন। ফ্রিজে যতদিন কুসুমের রান্না করে যাওয়া খাবার ছিল, ঘরদোর সেরকম ধুলো ধুলো হয়নি, টিভির পর্দায় যতদিন আশপাশে করোনার সংখ্যাটা খুচরো ছিল, ততদিন বেশ নির্বিঘ্ন ছিল জীবনটা। ওই নিয়মমাফিক সুচরিতার সঙ্গে শুধু ঝগড়াটা হত। আর এখন?

খাটে বসে চারদিকে চোখ বোলাল জয়ন্ত। সুচরিতা আজ সকালে আশ্চর্যজনকভাবে স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে একদম চুপচাপ। এমনিতে ঘুম থেকে ওঠার পর সুচরিতার কাজ হল বাড়ির কাজগুলো জয়ন্ত ঠিকঠাক করছে কি না তার ওপর কড়া নজর রাখা। তবে দিনে দিনে জয়ন্তর প্রত্যেকটা কাজের খুঁত ধরা ছাড়া বিশেষ চেঁচামেচি করে না। নিজেকে নানান অবোধ্য গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রেখেছে। অবশ্য সকালের চা-টা করে। সেই চায়ের কাপ জয়ন্তর বেডসাইড টেবিলেও নামিয়ে দিয়ে যায়। জয়ন্ত যখন ওঠে সেই চা ততক্ষণে ঠান্ডা হয়ে গেলেও মাইক্রোওয়েভ ওভেনে একবার ঘুরিয়ে নিলেই সমস্যা মিটে যায়। আজ সেই চায়ের কাপটা কোথাও চোখে পড়ল না। উলটে চোখে পড়ল ঝাঁটা। সুচরিতা স্টিলের আলমারির পাশে খাড়া ঝাঁটাটাকে দাঁড় করিয়ে গেছে।

মা বিশ্বাস করতেন ঘুম ভেঙে বিড়ালের ডাক শুনলে, ঝাঁটা দেখলে দিন নাকি খুব খারাপ যায়। সেসব ছিল বিজ্ঞান মনস্কতায় সব কুসংস্কার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার দিন। এখন বুঝছে মা কতটা সঠিক ছিল। এই ঝাঁটা এক অশনি

সংকেতের প্রতীক। সারাদিনের রুটিন ধরে কাজগুলো মনের মধ্যে ঘূর্ণি পাক দিতেই শরীরটা অস্থির হয়ে উঠল জয়ন্তর।

কিন্তু সুচরিতা গেল কোথায়? কোনও সাড়াশব্দ নেই। চুপ করে বিছানা ছেড়ে মেয়ের ঘরের সামনে এল জয়ন্ত। দরজাটা অল্প ফাঁক। আর সেই অল্প ফাঁক দিয়ে মেয়ের ঘরের ভেতরটা দেখে ভেতরটা কীরকম উথলে উঠল। সুচরিতা সাজগোজ করছে। দামি শাড়ি। তাহলে কি লকডাউন উঠে গেল? সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই কি প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ দিয়ে ফেলেছেন? তাই সুচরিতা সাজগোজ করে বাইরে বেরনোর জন্য সকালের চা করার সময় পায়নি?

সুখবরটা খোলসা করে জানতে দরজাটা অল্প ঠেলে ভেতরে ঢুকতে যেতেই সুচরিতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, "দেখছ একজন মহিলা চেঞ্জ করছে। কোনও ম্যানারস নেই। দরজা নক না করেই ঢুকে পড়লে। তোমার বাবা-মা কি তোমাকে কিছুই শেখায়নি? পড়ে পড়ে বেলা পর্যন্ত অনেক ঘুমিয়েছ। যাও গিয়ে নিজের কাজ করো। বাজারটা দিয়ে গেছে কি না সেটাও কি আমাকে দেখতে হবে?"

"ঋক," বারান্দার দিকে যেতে যেতে জয়ন্ত ঋকের বন্ধ দরজার সামনে ক্লান্ত গলায় হাঁক পাড়ল, "বাজারটা আজ একটু স্যানিটাইজ করতে হেল্প করবি বাবা? শরীরটা আজ ভালো নেই।"

বন্ধ দরজার পেছন থেকে উত্তর এল, "আঃ! বাবা চিল্লিও না। অনলাইন ক্লাস করছি।"

তেতো মুখে বারান্দায় এল জয়ন্ত। বারান্দা থেকে থলি ঝুলছে। থলির একটা সংকেত আছে। বাজার না আসা পর্যন্ত থলিটা হাওয়ায় আদুরে কিশোরীর মতো দোলে। বাজার কবে কী আসবে সেটা সুচরিতা ফোন করে বলে দেয়। কোনও একটা সময়ে বাজারের ছেলেটা সেটা দিয়ে যায়। তখন হাওয়ায় দোল খাওয়া থলিটা নিথর হয়। বাজার অবশ্য রোজই মোটামুটি একরকম। আলু, পেঁয়াজ, টম্যাটো, পটল, ঢেঁড়স ইত্যাদি। মাছ মাংসটা আলাদা।

জয়ন্ত বারান্দায় ঝুঁকে থলিটা দেখল। থলিটা এখন নিথর। অর্থাৎ বাজার চলে এসেছে। এবার সার্জিকাল গ্লাভস পরতে হবে। তারপর থলি উঠিয়ে এনে আনাজপাতি স্যানিটাইজ করতে হবে। সুচরিতা হোয়াটসঅ্যাপে চোদ্দোটা বন্ধুদের গ্রুপের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্যানিটাইজ করার বিভিন্ন পরামর্শ মেনে নিজস্ব একটা

ফরমুলা করেছে। ভয়ংকর পেটেন্ট নেওয়ার মতো ফরমুলা। সেটা অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। বারান্দায় এখন রোদ আছে। এটা এখনও ঘণ্টা দুয়েক থাকবে। প্রথমে সব আনাজ ওই রোদে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারা যেন গায়ে গায়ে লেগে না থাকে। দশ মিনিট পর শুরু করতে হবে স্যানিটাইজিং-এর প্রথম পর্ব। বাজারের থলিটা উঠিয়ে নিয়ে আনাজ রোদে ছড়িয়ে দেওয়ার আগে জয়ন্ত বালতি ভরতি জল, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, অ্যান্টিসেপ্টিকের বোতল, হলুদ গুঁড়ো, হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটা শিশি, শুকনো কাপড় ইত্যাদি নিয়ে এল। মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরতে গিয়ে দেখল কড়ি আঙুলের নখে গুঁতো খেয়ে গ্লাভসটা ছিঁড়ে গেল। এটা সুচরিতার চোখে পড়লে তুলকালাম হবে। আপাতত কড়ি আঙুলটা ভাঁজ করে যা করার করতে হবে।

বারান্দার রোদ্দুরে আনাজগুলো উলটে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জয়ন্ত। বাজারের ছেলেটা অন্য বাড়ির ডেলিভারি দিয়ে গেল নাকি? আজকের বাজারটা অন্যরকম। বেগুন, কাঁচকলা, উচ্ছে, রাঙা আলু, সজনে ডাঁটা। সঙ্গে আবার একটা বড়ির প্যাকেট, ঠোঙায় মোড়া কিছু মশলা। জয়ন্ত উঠে মেয়ের ঘরের সামনে এল। দরজাটা সেই একচিলতে ফাঁক করা। সেখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখল সুচরিতা মুখে ফেসমাস্ক লাগিয়ে বসে আছে। চোখের ওপর দুটো গোল গোল সবুজ শসা। ঠোঁটের ওপর সাদা রঙের কিছু একটা বস্তু। জয়ন্ত ইতস্তত গলায় বলল, "তুমি কি ডাঁটা..."

জয়ন্ত কথা শেষ করতে পারল না। সুচরিতা দুটো হাত তিরবিড়িয়ে নাচিয়ে কিছু ইশারা করল। তার দুটো মানেই হয়। এক, বাজারের ছেলেটা ভুল ডেলিভারি করেছে আর দুই, এগুলোই তো অর্ডার করেছি। অত প্রশ্ন করার কী আছে?

জয়ন্ত অপেক্ষা করল না। আজকাল ভুল ডেলিভারি করলেও ফেরত দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। অতএব ওগুলোই স্যানিটাইজ করতে হবে। রক্ষা একটাই। আজকে রান্না করার দায়িত্ব সুচরিতার। বারান্দায় ফিরে এসে মেঝেতে থেবড়ে বসে বালতির জলে ওষুধ গুলে থলি থেকে একে একে আনাজগুলো ফেলে দিল জয়ন্ত। জলের রংটা রঙিন হয়ে উঠল। এখন বেগুন ডোবালে বেগুনি, টম্যাটো ডোবালে লাল, রাঙা আলু গোলাপি, পটল সবুজ— একেক আনাজ একেক রং ছাড়ে। এত বিষ রং মাখানো আছে যে আনাজে, তাতে করোনা বাঁচবে কি?

আদৌ কি এগুলো স্যানিটাইজ করার দরকার আছে? বহুদিন ধরে জয়ন্ত ভাবছে অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই নিয়ে লম্বা একটা পোস্ট দেবে। কিন্তু লকডাউনের সময়ে বাড়িতে এত ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে যে সময়ই আর পাচ্ছে না।

স্বাধীন বিড়ালটা পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নেমে এখন দুলকি চালে শুনশান রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। জয়ন্তর বিড়ালটাকে দেখে ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করল। জয়ন্তর সব দুর্দশার সাক্ষী এই বিড়ালটা। কাল রাত্রে হোয়াটসঅ্যাপে অফিসের গ্রুপে কে একটা পোস্ট করেছে, ব্রিটেনে ১৭৫২ সালে ৩ সেপ্টেম্বর মানুষ রাত্রে ঘুমোতে গিয়েছিল আর উঠেছিল একেবারে ১৩ সেপ্টেম্বরে। মানে জীবন থেকে পুরো এগারো দিন গায়েব। মেসেজে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে লিপ ইয়ার কারেকশন ইত্যাদি যতই গম্ভীর তত্ত্ব থাকুক, জয়ন্তর মনে হয়েছে এই লক ডাউনের দিনগুলোর নামচা জীবন থেকে পুরো হাপিস করতে হবে। অফিসে দোর্দণ্ড বসের সেই বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানোর ইমেজটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু বাড়িতে আগে কাজ। স্যানিটাইজিং-এর প্রথম পর্ব মিটলে ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা, আসবাবপত্তরের ধুলো ঝাড়া, একটার পর একটা কাজ আছে আজকের রুটিনে।

লকডাউনের প্রথম দিন মনে হয়েছিল এই রুটিন মানা কোনও ব্যাপার নয়। বছর তিনেক আগে একটা ভ্যাকুম ক্লিনার সেলসম্যান বাড়ি বয়ে এসে বিক্রি করে গিয়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে একটার পর একটা অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কত সহজেই কোনায় কোনায় জমে থাকা একেকটা নাছোড়বান্দা ধুলো ফুস মন্তর করে সাফ করা যায়। তিন বছর আগে কেনা সেই ভ্যাকুম ক্লিনার অবশ্য খুব একটা ব্যবহার হয়নি। রোলারে জং ধরে যাওয়া ট্রেড মিলের ওপর পড়ে ছিল। আসল সময়ে দেখা গেল সেটা কোনও কাজের নয়, যেমন কাজের নয় স্যুইং মপারটা। আসল হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া এক অমোঘ উপদেশ। ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দিতে দিতে এগোতে হয়, আর ন্যাতা হাতে ঘর মুছতে মুছতে পিছোতে হয়।

গতকাল ঝাড়া-মোছার পরও জয়ন্তকে রান্না করতে হয়েছে। অফিসে অনলাইন মিটিং ছিল বলে পরশু মেয়ের সঙ্গে ডিউটি বদল করেছিল। এখন সবাই কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব রাখছে। কেউ এক্সট্রা ডিউটি করবে না। রান্না করাটাও

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল কোনও ব্যাপার নয়। পৃথিবীর যে-কোনও রান্নার গোপনতম রেসিপি আর রন্ধন প্রণালী হাতে-খুন্তিতে দেখিয়ে দেওয়ার হাজার হাজার ভিডিয়ো আছে ইউটিউবে। অনেক মাথা খাটিয়ে জয়ন্ত সার বুঝেছে, জিভে জল আনা কষা মাংস থেকে মশালা ভিন্ডি রান্না করার প্রণালীটা মোটামুটি একই রকম। প্রথমে কড়াইতে তেল গরম। তারপর ফোড়ন ছেড়ে হালকা নাড়াচাড়া। এরপর পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কুচো টম্যাটো ইত্যাদি দিয়ে কষাও। কষে যাও যতক্ষণ না আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে আর তেল ছাড়ছে।

তবে একটা 'তবে' আছে। ভিডিয়োতে সব বোঝা যায় না। তেল কখন ছাড়ছে, উনুনের আঁচটা লো মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে কাঁচা গন্ধ কখন চলে যাচ্ছে, এসব প্র্যাকটিক্যাল বুঝতে কড়াইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে মুখ পুড়েছে। তা ছাড়া দশ মিনিটের রন্ধন ম্যাজিকের ভিডিয়োতে কিন্তু ইন্সুরেন্সের ফাইন প্রিন্টে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মতো অনেক প্যাঁচ পয়জার বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে। আর রান্নার পদ্ধতিতে সবচেয়ে ভয়ংকর ধাপ হল, আন্দাজ মতো নুন। সব কিছু আধ চামচ, একচামচ মাপ বা ৩২০ গ্রাম, ৫৫০ গ্রামের মতো নিখুঁত ওজন বলা থাকলেও নুনের পরিমাণটা পৃথিবীর অতি বড়ো রাঁধুনিও বলে যেতে পারেনি। সবার সেই এক কথা, আন্দাজ মতো নুন দিন।

আরও আছে। শিল-নোড়ায় আদা-রসুন বাটা চন্দন বাটার মতো সহজ কাজ নয়। সেটা অবশ্য সুচরিতার সঙ্গে ঝগড়া করার ফাঁকে একটা সমাধান পেয়েছে। ফ্রিজে আদা-রসুন বাটার প্যাকেট আছে। তবে পেঁয়াজটা বাটতে হয় মিক্সিতে। প্রথম দিন পেঁয়াজটা মিক্সিতে বাটতে গিয়েও বিপত্তি হয়েছিল। সাতটা মিক্সি জারের মধ্যে কোনটা পেঁয়াজ বাটার জন্য যথোপযুক্ত সেটা অনুমান করে পেঁয়াজ ভরে মিক্সি চালাতেই ঢাকনা উড়ে গিয়ে গোটা দেওয়াল পেঁয়াজ মাখা হয়েছিল। জয়ন্ত ডিটারজেন্ট ঘষে ঘষে জায়গাটা একঘণ্টা ধরে পরিষ্কার করে পলেস্তরা বার করে দিলেও সুচরিতা দেওয়ালটার সামনে এসে এখনও পেঁয়াজের গন্ধ পেয়ে নাক সিঁটকিয়ে বলে, "একটা কাজও কি ঠিক করে করতে পারো না? বাবা-মা কি কিছুই শেখায়নি? অফিসে কাজ করো কী করে?"

জীবনটা ঘেঁটে গিয়ে কীরকম যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। অফিসের এক

দোর্দণ্ডপ্রতাপ বসের বুক ভরা আত্মবিশ্বাসটা এই কয়েক মাসে শুধু তলানিতেই এসে থেমে থাকেনি, দেশের জিডিপির মতো উলটো গোঁত্তায় চলছে। গোটা বেগুনগুলোর ওপর হলুদগুঁড়ো ছড়িয়ে মুছতে মুছতে জয়ন্তর চোখ ঝাপসা হয়ে হঠাৎ কান্না পেল জয়ন্তর। আজকাল শরীরে আর কোনও রোগ নেই। করোনার চোখ রাঙানিতে বোধহয় মৌসুমী বায়ু পরিবর্তনের সাধারণ সর্দিকাশি জ্বর শরীরকে জ্বালাতে ঠিক সাহস করে আসতে পারছে না। সুচরিতা অনলাইনে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর পালস অক্সিমিটার আনিয়েছে। সকাল-সন্ধে দু-বার করে মাপতে হয়। ৯৮% স্যাচুরেশন, ৮২ পালস বিট আর ৯৭.৪ শরীরের তাপমাত্রা। জয়ন্ত অবাক হয়ে দেখে বাড়ির আর তিন সদস্যর ওই তিনটে সংখ্যা অল্পবিস্তর ওঠানামা করলেও নিজেরটা অনড়। সুচরিতার মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করার রোগ আছে। আজকাল বুক ধড়ফড় করলে নিজের পালস দেখে যন্ত্রর ব্যাটারি আর ক্যালিব্রেশন ঠিক আছে কি না বুঝতে জয়ন্তরটা একবার মেপে নেয়। আসলে জয়ন্তর ওই একটাই গুপ্ত রোগ ধীরে ধীরে শরীরে জমিয়ে বাসা বাঁধছে আজকাল। বুকচাপা কান্নার রোগ। সেটা কোনও পালস অক্সিমিটার মাপতে পারে না। বেগুন মুছতে মুছতে সেই কান্নাটাই বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকল। আর সেটার সাক্ষী থাকল ওই মেনি বিড়ালটা। রাস্তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে আবার ডেকে উঠল, "ম্যাও।"

মোবাইলটা বেজে উঠল। জয়ন্ত স্ক্রিনে দেখল, সুচরিতা। আজকাল সুচরিতার এই এক হয়েছে। সময় নেই। এইটুকু একটা ফ্ল্যাটে হাঁক দিয়ে না বললেও শোয়ার ঘর থেকে কথা বারান্দায় স্পষ্ট শোনা যায়। তবুও মোবাইলে ফোন করবে। কয়েকদিন পরে হয়তো বাড়ির চারজনের কথা গুগল মিটে হবে।

জয়ন্ত চেটো দিয়ে চোখের কোল মুছে বলল, "হ্যালো।"

"কী হয়েছে তোমার? গলাটা এরকম লাগছে কেন? সকালে সব মেপেছ? গা ম্যাজম্যাজ করছে?"

"৯৮, ৮২, ৯৭.৪... সব ঠিক আছে।" জয়ন্ত গলা খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করল।

"বাজার দিয়ে গেছে? সব স্যানিটাইজ হয়ে গেছে?"

"হুম।"